আলো
পথ
এমএলই নিউজলেটার

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪
তৃতীয় সংখ্যা

সরকার সকল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক জায়গায় আনতে সচেষ্ট

- মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি বলেছেন, 'বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী আছে। সংখ্যায় কম হলেও তারা এদেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করছে। সরকার সকল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক জায়গায় আনতে সচেষ্ট। কাউকে বঞ্চিত না করে আসুন, সকলের ভাষা টিকিয়ে রাখতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।'

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বিকালে সিরডাপ মিলনায়তনে কারিতাস বাংলাদেশ-এর 'আলোঘর' প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা উপকরণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত ভাষণ দেন কারিতাসের পরিচালক মি. জ্যোতি এফ. গোমেজ।

'আলোঘর' প্রকল্প সাতটি আদিবাসী (গারো, খাসি, ওঁরাও, ম্রো, ত্রিপুরা, সান্তাল, চাকমা) ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের জন্য আটটি প্রাইমার উন্নয়ন করেছে। উল্লেখ্য, কারিতাস ছয়টি বিভাগে ১,০০৫ টি শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছে। এই সকল শিক্ষা কেন্দ্রের ৪০% শিক্ষার্থী আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন এমপি, প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযান -এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী এবং বাংলাদেশে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধি ড. পিয়েরে-ইভ্স ল্যার্ষট।

এ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন, এমপি বলেন, 'মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয়ে বাঙালি সর্বদাই সচেতন। এজন্যই বুকের তাজা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। মাতৃভাষা বাংলা হলেও সরকার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভাষাকে সম্মান দেয়।' বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী ভাষার মাসে এমন একটি উদ্যোগ গ্রহণ করায় কারিতাসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী।' তিনি বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, '৫টি আদিবাসী ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন সরকারের একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। এ উদ্যোগ একদিনে গৃহীত হয়নি। এজন্য এমএলই ফোরাম দীর্ঘ পাঁচ বছর সরকারের সঙ্গে দেন-দরবার করেছে। তিনি এ সকল কাজে সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ধরনের আয়োজনে সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তা আরো বাড়ানোর জন্য তিনি অনুরোধ করেন। ড. পিয়েরে-ইভ্স ল্যার্ষট বলেন, 'সকল ছাত্র ছাত্রীর জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ।' 'নিজের ভাষার পাশাপাশি জাতীয় ভাষা জানারও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।'

আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা : মূলধারায়নের কৌশল

২১ ডিসেম্বর ২০১৩, শনিবার 'আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা: মূলধারায়নের কৌশল' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আলো কার্যালয়ে। সেভ দ্য চিলড্রেনের সহায়তায় 'প্রথম আলো' এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নব বিক্রমকিশোর ত্রিপুরা প্রশ্ন তোলেন, আদিবাসীদের অনেকের ছেলেমেয়ে ঢাকার ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ছে, আর বাজার অর্থনীতির যুগে লোগাং বা পানছড়ির আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এটা বৈষম্য তৈরি করছে কিনা?

এনসিটিবি-এর চেয়ারম্যান শফিকুর রহমান বলেন, সরকার যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে চায়। শিশুদের বই সরাসরি অনুবাদ করলে হবে না। তা পরিগ্রহণ (অ্যাডাপ্ট) করতে হবে, যেন শিশুর পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে তা সংগতিপূর্ণ হয়। এরপর তা স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা সভায় উপস্থাপন করতে হবে। তারপর তা জাতীয় কাউন্সিলে পাস করিয়ে নিতে হবে। সবশেষে তা স্কুল পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হবে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে 'আদিবাসী' শব্দ ব্যবহার করা হলেও খসড়া শিক্ষা আইনে তা ব্যবহার করা হয়নি। 'মাতৃভাষা শিক্ষা' ও 'মাতৃভাষায় শিক্ষা'-র মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে আদিবাসী শিশুদের 'মাতৃভাষা শিক্ষা' কথাটি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

স্বাগত বক্তব্যে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও *প্রথম আলোর* সহযোগী সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম বলেন, মানুষ স্বপ্ন দেখে মাতৃভাষায়। মাতৃভাষায় স্বপ্ন দেখা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

খাগড়াছড়ির জাবারং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা বলেন, আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ও তাদের ভাষায় লিখিত উপাদান কম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সৌরভ সিকদার বলেন, পাঠ্যপুস্তক তৈরি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিশেষজ্ঞ ফোরাম গঠন না হওয়া প্রভৃতি মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, সংবিধানে বাংলাদেশের সব মানুষকে বাঙালি বলা অন্যায়, অগ্রহণযোগ্য ও আন্তর্জাতিক সনদের লঙ্ঘন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক পুলক চাকমা বলেন, বাংলাদেশে একটি ভাষানীতি থাকা দরকার।

সরকার আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয়ে কখন কী পদক্ষেপ নিয়েছে, তার বর্ণনা দেন গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক তপন কুমার দাশ।

সেভ দ্য চিলড্রেনের শিক্ষা সেক্টরের উপদেষ্টা ম. হাবিবুর রহমান বলেন, আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষকের স্বল্পতা আছে। একটু বাড়তি সুযোগ দিয়ে হলেও আদিবাসীদের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

গোলটেবিল বৈঠকে সেভ দ্য চিলড্রেনের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মেহেরুননাহার স্বপ্না বলেন, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদ্রি - এই পাঁচটি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবেন। কিন্তু সাঁওতালেরা কোন লিপি ব্যবহার করবে- এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি বলে সরকারি উদ্যোগের প্রাথমিক পর্যায়ে তারা অন্তর্ভুক্ত হতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে ব্র্যাকের পরিচালক আন্নামিনজ বলেন, কোনো উদ্যোগ আদিবাসীদের মধ্যে সামান্যতম কোনো বিরোধ বা বিভেদ সৃষ্টি করছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা জরুরি।

আলোচনার সমাপনী পর্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব কাজী আখতার হোসেন বলেন, সার্বিকভাবে বাংলাদেশ এগোচ্ছে। এ দেশের সব জাতিগোষ্ঠীর শিশুরাই শিক্ষা অর্জন করবে। আপাতত যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা অচিরেই দূর করার আশ্বাস দেন তিনি।

(সৌজন্যে : দৈনিক প্রথম আলো)

ককবরক ভাষা

ককবরক অর্থ ভাষা এবং বরক অর্থ মানুষ। দুটিকে সংযুক্ত করে বলা যায়, মানুষের ভাষা। ত্রিপুরা রাজ্যের বৃহত্তম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষার নাম ককবরক। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একে ম্রং বা

ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরা নৃত্য

ত্রিপুরা অথবা তিপরা বলেছেন। জর্জ গ্রিয়ার্সন বলেছেন, মুরুং। আর হান্টার বলেছেন, ম্রং। তবে হান্টার ককবরক ভাষাকে ম্রং না-বলে ককবরক ভাষাভাষী আদিবাসী গোষ্ঠীকেই ম্রং বলেছেন। ককবরকভাষী ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা এ ভাষাকে কেবল ককবরক বলেছেন তাঁর কক-বরক-মা (ত্রৈপুর ব্যাকরণ) নামক গ্রন্থে। গ্রন্থটি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অন্যদের রচনা তাঁর পরে প্রকাশিত হলেও তাঁরা একে ককবরক বলেননি, এমন কী কৈলাশচন্দ্র সিংহ-এর প্রকাশিত *রাজমালাতে* ককবরক নামটি নেই। রাধামোহনের বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল যে, ককবরক ভাষার পুরানো ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, কলই, মুরাছিঙ, রূপিনী ও উলছইজ্জ এ আটটি উপভাষা নিয়ে একটি শিষ্ট কথ্যভাষা তৈরি। এ ভাষার মাধ্যমে এদের ঐক্যবদ্ধ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হয়। এজন্য তিনি রাজরোষেও পড়েন। কারণ রাজ-পরিবার ত্রিপুরী হিসেবে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করছিলেন যুগ যুগ ধরে। কিন্তু ককবরকই আজ ভারতের অন্যতম রাজ্য ত্রিপুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা; যা কিনা বাংলার পাশাপাশি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। ককবরক ভাষা বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতেও প্রচলিত রয়েছে বলে জানা যায়।

কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম
(সৌজন্যে *শিক্ষাকোষ*)

ককবরক লিপি

ককবরক ভাষার নিজস্ব কোনো লিপি কখনো ছিল কিনা সন্দেহ। ১৮৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য ত্রিপুরার ব্রিটিশ এজেন্ট ককবরকভাষীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগরতলার

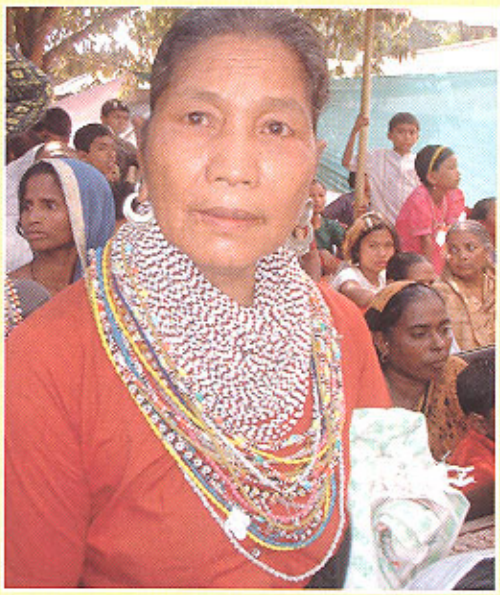

ত্রিপুরা নারীর অলঙ্কার

শিক্ষিত ঠাকুর লোকদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তারা বাংলা অক্ষরে ত্রিপুরী ব্যাকরণ ও শিশুপাঠ্য বই লেখেন। গ্রিয়ার্সন ত্রিপুরা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ত্রিপুরী ভাষার নমুনা ও শব্দসম্ভার প্রাথমিকভাবে বাংলা হরফে লেখা হয়েছিল। এটাই স্বাভাবিক। উভয় দেশ- বাংলাদেশ এবং ভারতের ত্রিপুরা সংলগ্নভাবে অবস্থিত বলে পরস্পর পরস্পরের সংস্কৃতিকে ধারণ করে আছে। ককবরকভাষীরা রাজ আমলেও বাংলাভাষার মাধ্যমে আধুনিক লেখাপড়ায় হাতেখড়ি দিতেন। বাংলালিপির সঙ্গেই তাদের পরিচয় হতো সর্বপ্রথম। মনের ভাব প্রকাশ করতে তারা বাংলালিপি ব্যবহার করতেন। বাংলালিপি ব্যবহার করে ককবরক ভাষায় সর্বপ্রথম বই লেখেন ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা এবং কাজী দৌলত আহমেদ-প্রথম জন ককবরকভাষী ত্রিপুরী এবং দ্বিতীয় জন বাঙালি। প্রথম জনের কক-বরক-মা (ত্রৈপুর ব্যাকরণ) প্রকাশিত হয় ১৩১০ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় জনের ককবরমা (ককবরকমা=কক-বরক ব্যাকরণ) ১৩০৭ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। তবে কেউ কেউ রোমান লিপিতে ককবরক ভাষা লেখার চেষ্টা করেন।

কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম
(সৌজন্যে *শিক্ষাকোষ*)

পাহাড়ি আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য প্রস্তাবিত নীতিমালা

আদিবাসী শিশুরা বাংলা বোঝে না। বাংলায় কথা বলতে পারে না। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিটি বিষয় (ইংরেজি ছাড়া) বাংলা ভাষায় লেখা। শিক্ষক পড়া বোঝানোর জন্য বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিশু ঝরে পড়ার হার ৬০%। এই হার বাঙালি শিশুর তুলনায় দ্বিগুণ।

২০০৮ সালে ২৬টি দেশে পরিচালিত ইউনেস্কোর একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ৫০% শিশু ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে ক্লাসে ব্যবহৃত ভাষা বুঝতে না পারা। বিশ্ব ব্যাংকের একটি গবেষণায় দেখা গেছে ৭৫ মিলিয়ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুর অর্ধেক শিশু বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ হচ্ছে ক্লাসে শিক্ষকের ভাষা বুঝতে না পারা।

বহুভাষিক শিক্ষা

মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক অথবা উপানুষ্ঠানিক দু'ভাবেই হতে পারে। এখানে শিশু ক্লাসরুমে প্রথমে মাতৃভাষায় পড়াশুনা শুরু করবে। তারপর ধীরে ধীরে বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবে। এ ব্যবস্থায় শিশু তার মাতৃভাষায় পড়াশুনা শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। এর মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক একটি মজবুত ভিত্তি গড়ে উঠবে। এই মজবুত ভিত্তিটির জন্য পরবর্তীকালে মাতৃভাষার পাশাপাশি বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষার সঙ্গে যথোপযুক্ত সংযোগ গড়ে তোলা সহজ হবে।

মাতৃভাষার সঙ্গে জাতীয় ভাষার সেতু ও শিশুর দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার প্রস্তুতি:

- শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাসী ও যোগ্যতাসম্পন্ন করে তোলে।
- যোগাযোগ ও শিখনের ক্ষেত্রে নতুন ভাষা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।
- মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি ভাষা শেখার যোগ্যতা অর্জন করে।

আদিবাসী শিশুদের বহুভাষিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার আদায়ের বাধা উত্তরণের উপায় হলো মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষাব্যবস্থা। এই শিক্ষাব্যবস্থা তাদের সংস্কৃতি, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা। শিক্ষার্থীরা দুই ভাষায় পারদর্শী হয় বলে তাদের সৃজনশীল মেধা বিকাশ সহজ হয়। নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা জ্ঞান লাভ করে। অন্য আরেকটি সংস্কৃতিতেও পারদর্শী হয়ে ওঠে।

শিক্ষক মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়া বুঝিয়ে দিলে দ্বিভাষিক শিশুরা তা দ্রুত শিখতে পারে। মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াশুনাকে নিরুৎসাহিত করলে শিখন বাধাগ্রস্ত হয়। বিষয়ভিত্তিক ধারণা অস্পষ্ট থেকে যায়।

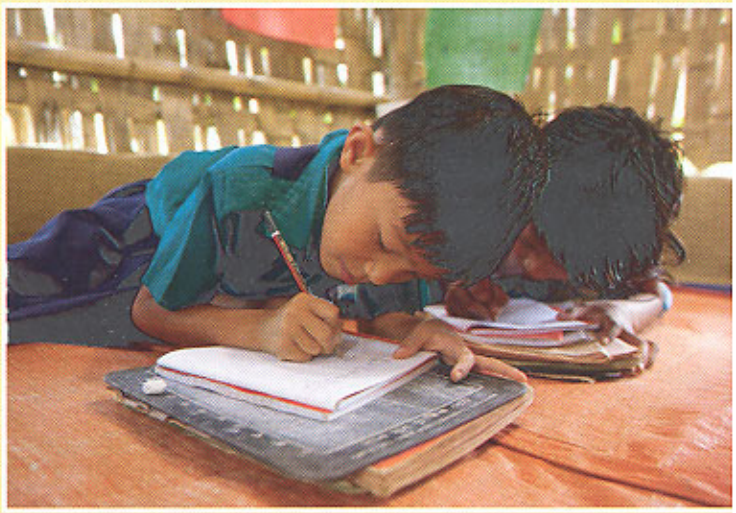

দ্বি-সাক্ষর

শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষা এবং বাংলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখতে, বলতে ও পড়তে পারে। গত ৩৫ বছরের ১৫০টি গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব ব্যক্তি একটা ভাষা জানে, তারা নিজেদের ভাষাকে সত্যিকার অর্থে জানতে এবং বুঝতে পারে না। কিন্তু দ্বি-সাক্ষর বা দ্বি-ভাষিক মানুষদের চিন্তা ও চেতনায় দুটি ভাষার জ্ঞান থাকে বলে তাদের অন্যান্য ক্ষেত্রে জ্ঞান আহরণের সুযোগ বেড়ে যায়।

দ্বি-সাংস্কৃতিক

শিক্ষার্থীদের নিজেদের সংস্কৃতি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে যেমন গভীর জ্ঞান থাকে, পাশাপাশি অন্য ভাষা বা ভাষার মানুষের সংস্কৃতি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকে। তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। নিজের জাতিগোষ্ঠীর বাইরের মানুষের সঙ্গে সহজে মিশতে পারে।

বাংলাদেশের জাতীয় নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিত

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে অনেক কৌশল, পরিকল্পনা কাঠামো ও চুক্তি আছে। এরই আলোকে দেশের চলমান আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি দীর্ঘস্থায়ী মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন করা সম্ভব।

সংবিধানের ২৮ নম্বর ধারায় বর্ণ, ধর্ম ও জন্মস্থান ভেদে যে কোনো ধরনের বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধান (১৫ এবং ১৭ ধারা) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে। সে সঙ্গে একটি সঙ্গতিপূর্ণ, গণভিত্তিক সর্বজনীন শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন এবং একটি নির্দিষ্ট স্তর অবধি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা আছে।

মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষাকে সফল করে তোলার জন্য করণীয়

১. মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে।
২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা চালু করতে হবে।

৩. আদিবাসী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্ব স্ব ভাষায় শিক্ষা উপকরণ তৈরি করতে হবে।

৪. স্ব স্ব কমিউনিটি থেকে অদিবাসী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

৫. আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারের 'জাতীয় শিক্ষানীতি', 'পিইডিপি-৩' এবং 'সবার জন্য শিক্ষা'র জন্য প্রণীত জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা-উপকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা সূচনার জন্য সরকারিভাবে নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ থাকতে হবে।

৭. শান্তিচুক্তি (১৯৯৭) অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের কাছে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্ব ধাপে ধাপে প্রদান করতে হবে।

৮. পিইডিপি-৩-এ পার্বত্য জেলা পরিষদকে যুক্ত করা হয়েছে, তবে পূর্ণাঙ্গভাবে এর কাজ শুরু করতে হবে।

৯. রাঙামাটি পিটিআই-এ মাতৃভাষায় শিক্ষা এবং ২য় ভাষা বাংলা বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১০. খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে পিটিআই স্থাপন করতে হবে। অথবা এসব জেলার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য রাঙামাটি পিটিআই-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১১. দুর্গম ও প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্কুল এবং পরবর্তী সময়ে সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক সহায়তা থাকতে হবে।

১২. এনজিও/কমিউনিটির শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারের স্বীকৃতি প্রয়োজন।

মেহেরুননাহার স্বপ্না

আদিবাসী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য লেখক প্যানেল মনোনয়ন

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি অবহিতকরণের লক্ষ্যে গত ৮ জানুয়ারি ২০১৪ সকাল ১১ টায় মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এস. এম. আশরাফুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। এ সভায় নির্বাচিত ৫টি আদিবাসী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য লেখক প্যানেল মনোনয়ন দেওয়া হয়। এরা হলেন :

চাকমা ভাষার জন্য সুগম চাকমা, আর্যমিত্র চাকমা, প্রসন্ন কুমার চাকমা, আনন্দ মোহন চাকমা, কীর্তিময় চাকমা, চুমকি চাকমা।

মারমা ভাষার জন্য ড. অংকু জাই মারমা, মংখেংচিং মারমা, মংজংসিং মারমা, হলাসিং থোয়াই মারমা, জলিমং মারমা, শৈফো চিং।

ত্রিপুরা ভাষার জন্য মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা, অলিন্দ্র ত্রিপুরা, প্রার্থনা কুমার ত্রিপুরা, জগদীশ রোয়াজা, সত্যহা পানজি।

সাদরি ভাষার জন্য যোগন্দ্র নাথ সরকার (টপ্প), কল্যাণী মিনজ, অজিত তিরকি, রনজিৎ মালো, বনগোপাল কেরকেটা, নির্মল কুমার মাহাতো।

গারো ভাষার জন্য আলবার্ট মানকিন, সৃজন সাংমা, বাঁধন আরেং, বাসর দাঙ্গো, এলম চিসিম।

এছাড়া শংকর চাকমা, শুভঙ্কর চাকমা, নাথান ব্যোম, মিলন জ্যোতি ত্রিপুরা, মংপু মারমাকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কার্যক্রমের ইলাস্ট্রেটর হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। কনক চাঁপা চাকমা সার্বিক শিল্প নির্দেশনায় থাকবেন বলেও সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আদিবাসী বিষয়ক জাতীয় কোয়ালিশন National Coalition for Indigenous People's (NCIP)

আদিবাসী বিষয়ক জাতীয় কোয়ালিশন (NCIP) হলো একটি প্লাটফর্ম। এটি আদিবাসী অধিকার রক্ষা ও তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে গড়ে উঠেছে। আদিবাসী বিষয়ক জাতীয় কোয়ালিশন (NCIP) জানুয়ারি ২০০৯ সাল থেকে আদিবাসী ইস্যুতে কাজ করছে। সংশ্লিষ্ট ৭৫টি সংগঠন নিয়ে একটি সাধারণ সভার মাধ্যমে এই কোয়ালিশন গঠন করা হয়।

আদিবাসী বিষয়ক জাতীয় কোয়ালিশন (NCIP) ২০০৯ সালে মাত্র ৭৫টি সংগঠন নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এই কোয়ালিশনের সদস্য সংখ্যা ৩১০। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ছাড়াও NCIP-র সঙ্গে যুক্ত আছে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক, নারীপ্রধান গ্রুপ, পেশাজীবী ও আদিবাসীবান্ধব বিভিন্ন সংস্থা।

২০০৯ সাল থেকে সদস্য সংগঠনের মাধ্যমে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় NCIP বিভিন্ন সভা, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ আয়োজন করছে। আদিবাসীদের উপর যে কোনো সহিংস হামলায় তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন, তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জনগণকে জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এ কোয়ালিশন। জাতীয় কোয়ালিশন আদিবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে কাজ করে আদিবাসীদের পক্ষে পলিসি পরিবর্তনেও বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সেভ দ্য চিলড্রেন, ব্র্যাক, ভিএসও, সিল, গণসাক্ষরতা অভিযানসহ ঢাকাস্থ ১৫টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা নিয়ে NCIP-র কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। NCIP-এর সেক্রেটারিয়েট হিসেবে গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC) কাজ করছে। সারা দেশের ২৯৫টি সংস্থাকে NCIP-র ২১টি আঞ্চলিক কমিটিতে ভাগ করা হয়েছে।

সাঁওতাল ভাষা
গান্ড গীরুড়

সেদায় যুগরে মড়েঁ বোয়হা আডি শিকারিয়ীকো তাঁহেকানা। মিতদিন অনকো'দ বুরুতে সেন্দরাকো চালাও এনা। অন্তে মিত গান্ড গারুড়, মড়েঁ বোয়হায় হারাড় গঅচ্ কেত কোআঃ। আর এ জমকেতকোআ।

মড়েঁ বোয়হা সেন্দেরাকো দুকীন সময় মারাং বোয়হারেন মিতটেন কীটিচ্ কোড়া গিদ্‌রীই তাঁহে কানা। উনি গিদ্‌রী হারায়েনা। মিতদিন এংগাৎতেৎ আর আয়চ্ হপন'গ তাকোয় কুলি কেত কোআঃ, ইঞ বাবা আর ইঞ হপন'বা তাকো দকো অকায়েনা? মেনাঃকোআ সেকো গয়চয়েনা? লীই আদেআকো সেন্দরা বীররে গান্ড গীরুড়এ হারাড় কেতকোআঃ। উনরে উনি কোড়া গিদরাই নিটয়ানা যে, উনি গান্ড গারুড় দঞ গজেগেয়া। আয়াক্' রিকিত লেকা মিতদিন অড়াক্'খন আঃক্'-সার আনতেয় মহন্তাএনা, পে দিন-এ তাড়ামকেদা, মুচীৎ'রে মিতদিন অকারে আয়চ্ বাবা তেকোকো গুর আকান অনা জায়গারেয় সেটেরএনা। আচকাগেয় ঞেলকেদে মিতটেন ঔড়ি মারাং গান্ড গারুড় আয়চ্ সেন-এ উডীউ হিজুঃকান। কোড়া'দ আঃক্' সার নিয়ীতেয় সনতরএনা। গীরুড় আয়চ সোর সেটেরঃতে তুইঞ কেদেয়া। কড়ামরেয় জসএনা গীরুড়'দ বীজিকাতে অতরেয় সলং ঞুরএনা আর-এ গঅচ্এনা।

ইনাতায়ম চীর কোল্ড-এ বেংগেত কেদা, মড়েঁ গোটেন হড় জাংএ ঞেলকেদা। মনরে পাতিয়ীউ হেএয়চ্ আদেয়া যে, নোআ জাংদ আয়চ বাবা আর হপন'বা তাকোয়াঃ কানগেয়া। বেচারা হমর-এ এহোপ এনা। উনিয়াঃক্' হমর আঞ্জমতে মারাং বুরু'দ হড় ছিনতেয় হেয়চ এনা আর-এ মেতাদেয়া, আলোম রাগ'আ কিচ্‌রিচ্‌তে নোআকো জাং অয়ো পটমমে। আর নঅয় মিত লোটাঃ দাঃক্'। অয়ো পটম জাং, পে পাঁক দাঁড়া পুরাউ কাতে ছিটিয়ীউ আম।

উনিদ মারাং বুরুয়াক্' কাথা লেকায় কীমিকেদা। সারিগে যতকো জিউয়াত এনা। হড়মো তিয়ীর বাড়াকো এহপ এনা। বুঝাউ কেয়াম ঔডি গীহির জীপিত খনকো এভেনএনা। আরকো মেনকেদা। দুরে! ঔডি বাঁড়িচ্‌বো জীপিত্ কেদা।

ইনাতায়ম উনি কোড়াকো কুলি কেদেয়া, আমদম অকয় কানা'? উনি'দ জতয় লাইকেদা। আডিকো রীস্কীয়েনা। মিততে অড়াকতেকো রুয়াড় এনা।

গণেশ সরেন

বাংলা ভাষা
গরুড় পাখি শিকার

প্রাচীন কালের কথা। এক গাঁয়ে সাত ভাই বাস করত। তারা খুব শিকার প্রিয় ছিল। একদিন তারা দূর দেশে এক পাহাড়ে শিকার করতে গেল। সে পাহাড়ে ছিল এক বিরাট আকারের গরুড় পাখি। পাখিটি শিকারিদের দেখে খুব রেগে গেল। তারপর সাত ভাইকে একে একে মেরে ফেলল।

সাত ভাই যখন শিকারে যায়, তখন বড় ভাইয়ের এক শিশু ছেলে ছিল। সে বড় হয়ে মা ও কাকীদের জিজ্ঞাসা করল, আমার বাবা ও কাকারা কোথায়? তারা জীবিত না মৃত?

জবাবে মা-কাকীরা বলল, তারা শিকারে গিয়েছিল। সেখান থেকে তারা আর ফিরে আসেনি। জানা গেছে, এক বিরাট আকারের গরুড় পাখি তাদের মেরে ফেলেছে।

যুবক মনে মনে শপথ নিল, সে ঐ গরুড় পাখিকে হত্যা করবেই। সে তীর-ধনুক নিয়ে রওয়ানা হলো। কয়েক দিন পথ চলার পর সে বাবা-কাকাদের মৃত্যুর স্থানে হাজির হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে দেখল, এক বিরাট আকারের গরুড় পাখি তার দিকে উড়ে আসছে। যুবক তীর-ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হলো। কাছে আসতেই গরুড় পাখি বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল। পাখিটি হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং মারা গেল। এরপরে সে সাতটি নরকঙ্কাল দেখতে পেল। সে নিশ্চিত হলো, এগুলো তার বাবা ও কাকাদের কঙ্কাল। তখন সে বিলাপ করতে লাগল।

তার বিলাপ শুনে মারাং বুরু সন্ন্যাসীর বেশে তার কাছে এলেন। হাতের জল ভর্তি ঘটি দিয়ে বললেন, তুমি এই কঙ্কালগুলো কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। এরপর ঘটির জল ছিটিয়ে দাও।

যুবক তাই করল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, তারা জীবিত হয়ে আড়মোড়া দিচ্ছে। ওরা বলছে, অনেকক্ষণ খুব খারাপ ঘুম ঘুমালাম।

পাশে আগন্তুক যুবককে দেখে তারা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? যুবক তাদের সম্পূর্ণ ব্যাপারটি খুলে বলল। তারপর তারা খুব খুশি হলো এবং সকলে বাড়ি ফিরে এল।

অনুবাদ : মারডি গণেশ মাঝি

মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারে

নর্দান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

নর্দান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এনডিএফ (পূর্বের বিএনইএলসি-ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন) ১৯৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এনডিএফ'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে বঞ্চিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নিজেদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করে যেকোনো ধরনের বৈষম্য হতে মুক্তি লাভ করবে।

সমাজের সবচেয়ে বঞ্চিত নৃ-গোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এনডিএফ কাজ শুরু করে।

এনডিএফ'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে আরও আছে-

- অর্থপূর্ণ এবং সন্তোষজনক জীবনযাপনের জন্য ছেলেমেয়ে ও বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা।
- সমাজের বঞ্চিত শিশু ও বয়স্কদের অর্থপূর্ণ জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা বিষয়ক সুবিধাসমূহের প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ।
- নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ।

এনডিএফ ১৯৯৪ সাল থেকে এমএলই কার্যক্রম শুরু করে। সংস্থাটির কার্যক্রম দিনাজপুর, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, রাজশাহী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ১৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ইন্টিগ্রেটেড-প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (আইসিসিবি) প্রোগ্রামের মাধ্যমে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সান্তালী ভাষায় বাংলা ও ইংরেজি বই পড়ানো হয়। এনডিএফ ১৯৯৪ সালে এই উপকরণ তৈরি করে। এছাড়া কারিতাসের উপকরণ ব্যবহার করে। এনডিএফ-এর নিজস্ব এমএলই বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নাই। তবে রিফ্রেশার কোর্সে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এনডিএফ বাস্তবায়িত এমএলই বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ হলো :

- প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সান্তালী ভাষায় লিখিত বই পঠন-পাঠন।
- প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে মাতৃভাষায় শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন।
- আদিবাসী বিষয়ক আন্তর্জাতিক বা জাতীয় দিবসে মানববন্ধন, র‍্যালি আয়োজন ও স্মারক লিপি প্রদান।
- সান্তালী ভাষায় স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ গান প্রশিক্ষণ।

ভিক্টর লাকড়া

আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা (এমএলই) নিয়ে কর্মরত সকল সংস্থাকে পহর নিউজলেটারে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে ছবিসহ এ কর্মসূচির পরিচিতি পাঠাতে অনুরোধ করা হল।

আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রশ্নে এমএলই ফোরামের আহবায়ক ও মানবাধিকার কমিশনের সদস্য কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের সঙ্গে কথোপকথন

প্রশ্ন : সরকার ইতোমধ্যে ৫টি ভাষায় এমএলই উপকরণ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য আর কী কী উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আমি আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণকে সাধুবাদ জানাই। শিক্ষানীতি ২০১০- এ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সব আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিলম্বে হলেও সরকার এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। আমি তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এ প্রসঙ্গে এমএলই ফোরাম সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এমএলই ফোরামের মতামতসমূহকে গুরুত্ব দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও আশা করি, ২০১৪ সালের মধ্যেই আদিবাসী শিশুদের হাতে বইপত্র তুলে দেওয়া হবে। পাশাপাশি এও বলতে চাই, শুধু প্রি-প্রাইমারিতে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে চলবে না। ধাপে ধাপে ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণির শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের কাজও শেষ করতে হবে। আমি মনে করি, এ বিশাল দায়িত্ব পালনে অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতে সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগ এমএলই ফোরাম সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করবে। সকলের যৌথ প্রচেষ্টাতে এ উদ্যোগ সফল হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন : সাওঁতাল শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে আপনার অভিমত কি? সাওঁতাল জনগোষ্ঠীর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কীভাবে নিরসন করা যায়? কোন হরফে তাদের পাঠ্যপুস্তক হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : এমএলই ফোরাম থেকে জনসংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে প্রথমত ৬টি আদিবাসী ভাষায় উপকরণ প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর একটা অংশ মনে করে যে তাদের উপকরণ হবে রোমান হরফে আর একটি অংশ মনে করে তাদের উপকরণ হবে বাংলা হরফ ব্যবহার করে। এ নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ক এমন প্রকট হলো যে শেষ পর্যন্ত সরকার সাঁওতাল ভাষায় উপকরণ উন্নয়নের কাজটাই স্থগিত করে দিল।

আমি মনে করি, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর একমতে আসা উচিত। তাদেরই বসে ঠিক করা উচিত, কোন হরফে সাঁওতাল ভাষার উপকরণ প্রণীত হবে। এটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে হয়তো একসময় দু' ভাষাতেই তাদের উপকরণ উন্নয়নের উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু নিজস্ব মাতৃভাষায় সাঁওতাল শিশুরা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে যাতে বঞ্চিত না হয় তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন: আদিবাসী শিশুদের কৈশোরকালীন বিকাশে গৃহীত সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় কীভাবে হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? এ ক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন?

উত্তর : আমাদের দেশে যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেই একটা বড় সমস্যা হচ্ছে সমন্বয়ের অভাব। আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার কাজটি যাতে সমন্বিতভাবে হতে পারে তার জন্যই গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে এমএলই ফোরাম গঠিত হয়েছে। আমি মনে করি, সংশ্লিষ্ট সকল এনজিও বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় এনজিওদের এ ব্যাপারে সজাগ ও সচেষ্ট থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, অনেক এনজিওরই বিচ্ছিন্নভাবে অনেক বড় উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষমতা আছে। কিন্তু গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে সমন্বিত উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। তাই যে কোনো নীতি নির্ধারণীমূলক কাজ যাতে সমন্বিতভাবে করা হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

সরকারকে বুঝতে হবে আদিবাসীরা অত্যন্ত সংবেদনশীল। যুগ যুগ ধরে নানাভাবে তাদের নিয়ে নানা পক্ষ নানা ধরনের স্বার্থ হাসিল করেছে। এখন সরকার যা করছে তা অবশ্যই আন্তরিক ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে। আর এজন্য সব কিছুতে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সরকারকে যথাযথ সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এমএলই ফোরাম এ উদ্যোগ এগিয়ে নেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি। মনে রাখতে হবে, আদিবাসীরা তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে অনেক সময় সামনে আসতে পারে না। তাই আমাদেরই তাদের কাছে যেতে হবে। তা করতে পারলেই সকলের মঙ্গল হবে।

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক পরীক্ষামূলকভাবে এমএলই নিউজলেটার **পহর** প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো ধরনের মতামত 'গণসাক্ষরতা অভিযান'-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

European Union

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় **গণসাক্ষরতা অভিযান**
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.camebd.org